লোকসাহিত্যে রাজবংশি সমাজ ও সংস্কৃতি
বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী

অসীম বর্মন

সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে
কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে
খরোশান থেকে বাদকশান
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।
শ্রান্ত উটের পায়ে-পায়ে যেখানে উড়েছে মরুর বালি
চমরীর খুরে লেগেছে বরফট-গলা কাদা!

—প্রেমেন্দ্র মিত্র : 'পথ', "সম্রাট"

মহামারীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন মৃত্যুভয় অর্জুনের লক্ষ্যভেদী তীরের মতো এগিয়ে আসছে, অন্যদিকে তেমনি মন অনেকটা পাখিদের মতো হয়ে উড়ে যেতে চায় বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলীর খোঁজে। যে পদাবলীতে আমরা খুঁজে পাবো লোকসাহিত্যে রাজবংশিদের সমাজ ও সংস্কৃতির কথা। তবে গৌরচন্দ্রিকাতে জেনে নিই লোকসাহিত্য ও রাজবংশি সম্পর্কে। 'লোক' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে 'Folk' ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধারণত গ্রাম্য সমাজই লোকসমাজের ভিত্তিভূমি। সহজ করে বললে 'লোক' অর্থে ব্যক্তিমানুষ নয় গোষ্ঠী। 'লোক' বলতে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরে সুনির্দিষ্ট একটি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী জনসাধারণকে বোঝায়। আর এই সমস্ত জনসাধারণের অতীত ঐতিহ্য ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে মৌখিক ধারায় রচিত সাহিত্য হলো 'লোকসাহিত্য'।

সাধারণত অক্ষরজ্ঞানহীন গ্রামীণ মানুষরা এর ধারক ও বাহক। তবে লোকসাহিত্য শুধু গ্রামীণ মানুষেরই সাহিত্য নয়, নাগরিক জীবনে খেটে খাওয়া মানুষদের লোকাচারও এই লোকসাহিত্যের অংশ। আসল কথা লোকসমাজের মন তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেলেই হলো। লোকসাহিত্য কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচনা হলেও রচয়িতার নাম জানা সম্ভব হয় না। সমগ্র সমাজ যখন তাকে মেনে নেয় তখন তা সমষ্টি হয়ে যায়। আর সমষ্টির চর্চায় তা পুষ্টি ও পরিপক্কতা লাভ করে। এজন্য লোকসাহিত্য সমষ্টির ঐতিহ্য, আবেগ, চিন্তা, মূল্যবোধকে ধারণ করে। লোকসাহিত্য মৌখিক ঐতিহ্যর পথ ধরে সমষ্টির অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল বংশ পরম্পরায় দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। নিজের দেশ-জাতি-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে

হলে আগে লোকাচারবিদ্যা জানা দরকার। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলো এ বিষয়ে আমাদের শেকড়ের সন্ধান দেয়।

এবার জানা যাক, রাজবংশি কারা? এ ব্যাপারে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন কথা বলেন। ডালটন, হ্যামিলটন, রেইসলে-রা বলেন রাজবংশিরা একটা আদিবাসী জনগোষ্ঠী, তাদের মতে রাজবংশিরা 'কোচ' জাতি থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে রাজবংশিরা নিজেদের কোচরাজার বংশধর মনে করেন। প্রায় সমস্ত উত্তরবঙ্গ জুড়ে রাজবংশিয় জনগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ, চলাফেরা প্রায় সকলেরই এক। ভাষাগত দিক থেকে হয়তো খানিকটা হেরফের আছে। এক অঞ্চলের জনসমাজের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের বিশেষ কোনো পার্থক্য চোখে পরে না। সকলেই একই মায়ের সন্তান বললে অত্যুক্তি হবে না।

রাজবংশিদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রয়েছে যা স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। তাদের পূজা-পার্বণ, খাদ্যাভাস, রীতি-নীতি, ভাষা, চলন-বলনে এমন কিছু সংস্কৃতি রয়েছে যা তাদের নিজস্ব। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা—ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, পাঁচালি, লোকসংগীত, লোককথা প্রভৃতিতে রাজবংশিরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছেন। তাদের আলাদা ভাষাশৈলী, অলংকার, উপমা, রূপক স্বতন্ত্র মৌলিকতার দাবি রাখে। তাই লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে রাজবংশি সমাজের জীবন ও সংস্কৃতির বিষয়গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

গ্রাম্য লোককবি রতিরাম দাসের 'জাগ গান' বা 'মদনকামের গান' রাজবংশি সমাজের সংস্কৃতির অংশ। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে মদনকামের পূজা হয়। রংপুর, ধুবরী, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এই গান প্রচলিত। বাঁশকে একাধিক দেবতার প্রতীক হিসেবে ধরে পুজো করার রীতি আছে। গানের মাধ্যমে গানের জন্মকথা, মৃত্তিকা সৃজন, কার্পাস খেতি, কাপড় তৈরির আদিকথা সুর করে গাওয়া হয়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে জাগ গানের মিল রয়েছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম জাগ গানে, সাধারণ মানুষের প্রেম জৈবিক প্রেমে পর্যবসিত হয়েছে। তবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর সঙ্গে মিল থাকলেও জাগ গান আদি রসাত্মক গান নয়। এটি শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জেগে ওঠার গান। তাই এই গানকে জাগরী সংগীতও বলা হয়। জাগ গান কথা-ভাষ্য অনুসারে দুই শ্রেণির। মোটা জাগ গান আর সরু জাগ গান, লীলা জাগ গান, কানাই ধামালি (কৃষ্ণ ধামালি) নামেও পরিচিত। এই জাগ গানের মধ্যে সমকালীন সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষক সমাজের উপর অত্যাচার-শোষণ, কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা এবং সর্বোপরি রাজবংশি সমাজ ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ পদচিহ্ন অঙ্গ হলো জাগ গান। আকালের একটি গান হলো—

রাজার পাপে প্রজা নষ্ট দেওয়ার নাই জল।
মাঠে ধান জ্বলিয়া গেল ঘরে নাই সম্বল॥
বচ্ছরে বচ্ছরে এলা হইতেছে আকাল।
চালে নাই খ্যাড় কারো ঘরে নাই চাল॥
মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া।
বেটা ছাড়ে বেটি ছাড়ে নাই কারো মায়া॥[১]

গানগুলির মধ্যে দিয়ে ওইসব প্রচলিত অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, রাজবংশিদের জীবনদর্শন, আচার, সংস্কার-সংস্কৃতি প্রভৃতি ফুটে ওঠে। আবার লোকধর্ম, ইতিহাস, সমাজদর্শন, সর্বোপরি লোকশিক্ষার বাহন এই জাগ গানগুলি।

মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যেও রাজবংশি সমাজের জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। রাজবংশি সমাজে চণ্ডীর পুজো আজও প্রচলিত। উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে আজও চণ্ডীর পাঁচালি শোনা যায়। চণ্ডীর গান আবার কোথাও 'মঙ্গালচণ্ডী'র গান নামেও প্রচলিত। মানিক দত্তের পাঁচালি সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—"কাব্যের পুথি উত্তরবঙ্গের। উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করিয়া মালদহ অঞ্চলে, এই পাঁচালী গান এখনও চলিত আছে।"[২] 'মনসামঙ্গাল' 'পদ্মপুরাণ' কাব্যেও রাজবংশি সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। মানকরের কাব্যে দেখব শিবের বংশীবদন ও কোচ রমণীর প্রতি প্রেমের আর্তি রাজবংশি সমাজ ভাবনাকেই প্রতিফলিত করে। রাজবংশি সমাজে মনসা বিষহরী'র প্রভাব প্রকট। উত্তরবঙ্গের বেশকিছু অঞ্চলে এই গানের প্রভাব লক্ষিত হয়। রাজবংশিদের বাড়িতে মনসার থান বাস্তু দেবতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। পুজার্চনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিজস্ব। কোনো তিথি-নক্ষত্র নেই, যেকোনও অনুষ্ঠানের আগে বা যেকোনো সময়ে নিজেরাই পুজার্চনা করে। কবি জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গাল' উত্তরবঙ্গের রাজবংশি সমাজজীবনে সর্বাধিক প্রচলিত। এই কাব্যে রাজবংশি সমাজের নানা জীবন-সংস্কৃতির পরিচয় আছে; এমনকি নানা আচার-নিয়ম-রীতির কথাও মেলে—

মাঝিয়াত নাই মাটি
চতুর্দিকে নাই চাটি
বাহিরে না পড়ে তার পানি॥
ঘরে আছে সর্বস্ব ভাঙ্গা আছে দলী দল
মৎস্যের শুকটা দলা (সিদল) সাত॥[৩]

শুকটা মাছ খাওয়ার রীতি আছে রাজবংশি সমাজে। এই মনসামঙ্গল গানগুলি রাজবংশিদের জীবনচর্চা, মনন, সুখ-দুঃখ, নারীর ভাবনা, অভিপ্রায়, সংস্কৃতি প্রভৃতির পরিচায়ক।

নাথ গীতিকাগুলির মধ্যেও রাজবংশি সমাজের বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। রাজবংশি সমাজের মধ্যে এই নাথ ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। উক্ত গীতিকাগুলি রাজবংশি সমাজের উৎকৃষ্ট দলিল। ভাষাবিদ স্যার আব্রাহাম গ্রিয়ারসন অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের গ্রাম-গঞ্জ থেকে ছড়া, পাঁচালি, ছিল্কা সংগ্রহ করে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে 'মানিকচান্দ রাজার গান' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তারপর তৎকালীন রংপুর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য কিছু গান সংগ্রহ করেন, তার সংগৃহীত এই গানগুলি ড. দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়দ্বয় সংকলন করে বই আকারে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে প্রকাশ করেন।

এরপর আরও কিছু গান সংগ্রহ করে নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ঢাকা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেন 'ময়নামতীর গান' নামে একটি গ্রন্থ। এই গানগুলি নাথ সম্প্রদায়ের যোগীগণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে এই গানগুলি লোকসাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে। এগুলি ছিল আখ্যানমূলক লোকগীতি। প্রেম-ভালোবাসা ছাড়াও এই

আবার আব্বাসউদ্দিন-এর একটি বিখ্যাত গানে ব্রিটিশ বিরোধিতা এবং সমকালীন সমাজের পরিচয় ফুটে উঠেছে রাজবংশি ভাষায়—

> ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়া রে/চতুর্দিকে জ্বলে সুরুয বাতি/তোমরা ক্যানে আঁধার রাতি রে॥/হায়রে হায়, পরের বোঝা তোমরা কদ্দিন বইবেন ভাই/ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে॥/বালুটিটি পংখী কাঁদে নিজের আহার খুঁজির বাদে রে/হায়রে হায়, তোমরা বুজি নেও নিজের অধিকার/ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে॥/এক বেলা তমার অন্ন জোটে,/পেন্দোনোত তোমার কাপড় কোনটে/হায়রে হায়, তোমরা বুজি নেও নিজের অধিকার/ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে॥/তোমার হাতোত ভাইরে কোদাল কাঁচি/তবু প্যাটে পাথর বাঁধি আছেন বাঁচি রে,/ আর তোমরায় জোগান ভাত/ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে॥

প্রভৃতি লোকসংগীতগুলির মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে রাজবংশিদের জীবনের নানা পরিচয়।

রাজবংশি সমাজে ব্রতকথা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। নারীরা এই সমস্ত ব্রত পালন করেন। এই ব্রতগুলিতে যেমন প্রাচীনকালের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি এগুলি রাজবংশি সমাজের জীবন ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। সুবচনী, মেচেনী, ধরমঠাকুর, হুদোম দ্যাও, কাত্যায়নী প্রভৃতি ব্রতকথা ও গানে তাদের জীবনের নানা আচার-বিশ্বাস-সংস্কার-ভাবনা প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুবচনী ব্রতকথায় যেমন সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আছে তেমনি সামাজিক রীতিনীতি, জীবন-জীবিকার বৈচিত্র্য এবং সমকালীন সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় মেলে। সে সময়কার রাজবংশি সমাজের বিবাহের বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি 'কাত্যায়নী ব্রত'তে পাবো। 'হুদোম দ্যাও' পুজোয় বৃষ্টি কামনায় নগ্নদেহে নারীর নৃত্য ও গীতি প্রভৃতির মধ্যে আদিম কৌম সমাজের পরিচয় মেলে। এই সমস্ত ব্রতকথায় সমাজে নারীর অবস্থা, নারীর কষ্ট, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেমন পরিচয় আছে এবং সর্বোপরি তা সমকালীন রাজবংশি সমাজের দলিল।

লোকনাটকগুলির মধ্যেও রাজবংশিদের সংস্কৃতির আনাগোনা। 'হালুয়া-হালুয়ানি' পালায় কৃষক পরিবারের সুখ-দুঃখের কথা ফুটে উঠেছে। স্বামীর সেবা করতে করতে হালুয়ানির অর্ধেক রাত পার হয়। তার যৌবন থাকে অপূর্ণ। নারীর দুর্ভাগ্যের বর্ণনা রাজবংশি সমাজকেই চিহ্নিত করে—

> মোর মনটা কান্দেছে গো বাই
> জোহিলা পড়া টাক দেখিয়া
> গরম জলের নোটাটো মিছরির ডিকাটো
> লইয়া কতয় করিম মুই উটাসলা
> আধা রাতিয়া।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের ফলে রাজবংশি সমাজেও বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শ গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই ধর্মীয় আবেশ নিয়ে তৈরি লোকনাটক 'কুঞ্জলীলা' বা 'কুঞ্জবন পালা'। দার্জিলিং অঞ্চলে প্রচলিত এই পালায় রাজবংশিদের জীবনের নানা ছবি ধরা পড়ে। রাজবংশি সমাজে 'বিষহরী'র প্রভাব প্রকট। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আগে 'বিষহরী' পালা অনুষ্ঠিত হয়। রাজবংশি সমাজে অতিথি অভ্যর্থনার সময় পান, গুয়া দেওয়ার রীতিটি 'সতী বেহুলা' পালায় আছে। চাঁদ সদাগর যখন তার ছেলের সঙ্গে বিবাহ ঠিক করার জন্য বেহুলাকে দেখতে যান তখন আমরা দেখি—'ভালো কথা, একে না গুয়াপান আনেক, হুক্কাটা আনেক।' 'চোরচুন্নি'

লোকনাটকেও রাজবংশি ভাষা ও সংগীত দেখতে পাওয়া যায়। চোরচুন্নির সুখ-দুঃখে ভরা দাম্পত্য জীবন বর্ণনা, রাজবংশি গার্হস্থ্য জীবনকেই চিনিয়ে দেয়—

ওরে মনের কথা তোক রে চড়া
কবার চাছ মুই আজি
ওরে মোক কনেক দেখেয়া আনেক বড় ভান্ডানি।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রচলিত লোকনাটক 'খন' গানও রাজবংশিদের জীবন ও সংস্কৃতিকে চিনিয়ে দেয়। রাজবংশি সমাজে গরিব পরিবারের মধ্যে অর্থের তাড়নায় স্ত্রী বা কন্যাকে বন্ধক দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত 'মায়া বন্ধকী খন' গানে এর চিত্র পাওয়া যায়। মা-এর উক্তি স্বামীর প্রতি—

'স্বামী তমরা কেমন মাঞ্চি/মায়াটাক বানাইলেন স্বামী জিনিস বন্ধকী/বাপে যুগে নাই শুন মুই/নয়া নয়া কথা/মায়াটাক বন্ধুকী থুইয়া স্বামী/কে দেছে সেবা।[৬]

এ সমস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোতে রাজবংশি সমাজের জীবনচর্চা, সংস্কৃতি, আচার, রীতিনীতি প্রভৃতির চিত্রগুলি আমরা পেয়ে থাকি। এইভাবে লোকসাহিত্যের বহু অঙ্গনে রাজবংশি সমাজের বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

উৎসের সন্ধানে

১. সুখবিলাস বর্মা : 'জাগ গান', আর্ট পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০, পৃ. ৮১
২. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দশম মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ৪৫৭
৩. সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত : 'কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ২৯০
৪. নারায়ণ চন্দ্র বসুনীয়া : 'গোরক্ষনাথের গান লোকপুরাণের আঙিনায় রাজবংশি জীবনকথা', গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৫০-৫১
৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (৩য় খণ্ড), সংস্করণ ১৯৬৬, পৃ. ৩৮৯
৬. দেবেশ গোস্বামী : 'দক্ষিণ দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি', (সম্পাদনা : রিপন সরকার), সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, পৃ. ১৫০